জাগো বাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব

সংখ্যা ১৪৩০

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব

সংখ্যা ১৪৩০

সম্পাদক

সুখেন্দুশেখর রায়

বার্তা সম্পাদক

অভিজিৎ ঘোষ

উৎসব সংখ্যা সম্পাদনা

দেবাশিস পাঠক

বিন্যাস

নাজির হোসেন লস্কর

টিম উৎসব সংখ্যা

প্রীতিকণা পালরায়, মণীশ কীর্তনিয়া, শিবনাথ দাস, দিব্যেন্দু ঘোষাল, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী, অংশুমান চক্রবর্তী, শুভেন্দু চৌধুরি, সুখেন্দুকুমার ভাস্কর, প্রশান্ত মিশ্র, বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, অমিত কুমার মহলী, জয়দীপ চক্রবর্তী

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।

সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072

• Regd. No. WBBEN/2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014

City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kol-20

সূচি

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব

সংখ্যা ১৪৩০

প্রচ্ছদ
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ
যোগেন চৌধুরি

তৃতীয় প্রচ্ছদ
শমীন্দ্রনাথ মজুমদার

সম্পাদকীয় [৫]

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা [৬]

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা [৭]

বিশেষ কলাম

- চব্বিশেই দেশ হবে দ্বেষ মুক্ত [৯]
  অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

- লোকসভার লড়াই [১৩]
  সুব্রত বক্সি
- বাংলা ভাগের চক্রান্ত রুখছি, রুখব [১৭]
  সুখেন্দুশেখর রায়
- সাম্প্রদায়িক বিজেপির ঠাঁই নেই বাংলায় [২১]
  অরূপ বিশ্বাস
- প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন জননেত্রীই [২৩]
  ফিরহাদ হাকিম
- জাগ্রত বাংলা [২৫]
  ব্রাত্য বসু
- পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের রাজনৈতিক দ্বিচারিতা [৩১]
  শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
- দু'জন প্রধানমন্ত্রী বৈপরীত্যের উদাহরণ [৩৫]
  সৌগত রায়
- ঋষ্যশৃঙ্গ [৩৯]
  নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
- লড়াইটা ভারত রক্ষার [৪৯]
  পূর্ণেন্দু বসু
- চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি [৫৫]
  গৌতম দেব
- INDIA কী এবং কেন? [৬৩]
  পার্থ ভৌমিক
- সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবাংলার সমবায় [৬৭]
  মইনুল হাসান
- আমার চোখে কবি সাধু রামচাঁদ মুর্মু [৭৩]
  বীরবাহা হাঁসদা
- সংসদে হঠাৎ তড়িঘড়ি আনা হল মহিলা সংরক্ষণ বিল [৭৭]
  দোলা সেন
- আমার কথা, দিদির সাথে [৮১]
  ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার
- বিজেপির ডবল ইঞ্জিনের ব্যর্থতার জ্বলন্ত উদাহরণ মণিপুর [৮৩]
  সুস্মিতা দেব
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত অধ্যায় ও বর্তমান ভারত ইতিহাসের গৈরিকীকরণ [৮৫]
  মৃত্যুঞ্জয় পাল
- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ছাত্র পরিষদ [৯১]
  জয়প্রকাশ মজুমদার
- বঙ্গে সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ [৯৭]
  দেবনারায়ণ সরকার
- মমতা সরকারের হাত ধরে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নবজোয়ার [১০২]
  বিজন সরকার
- সম্প্রীতির বাংলা, উৎসবের বাংলা [১০৫]
  কামাল হোসেন
- দেশের শিক্ষা সংকট ও বাংলার ছাত্রসমাজ [১০৭]
  তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য

সূচি

- দিদি থেকে অভিষেক অভিন্ন রাজনৈতিক পরম্পরা [১১১]
  জয়ন্ত ঘোষাল
- বই পড়া কি কমে যাচ্ছে? [১২১]
  প্রচেত গুপ্ত
- দেশনেতৃকা [১২৫]
  অশোক মজুমদার
- অশোকস্তম্ভ [১২৯]
  অর্পিতা চৌধুরী
- মণিপুরের গন্ধ [১৩৫]
  সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়
- বিলুপ্ত হবে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা ও বসন্তোৎসব? [১৩৭]
  কৃষ্ণকুমার দাস
- অগ্নিযুগের সেই মেয়ের খোঁজে [১৪১]
  কিংশুক প্রামাণিক
- মৃত্যু পাক একটু মহিমা, একটু শিশির [১৪৪]
  ভাস্কর লেট
- অধিনায়ক জয় হে [১৪৮]
  অদিতি গায়েন
- আড়ালে থাকা নারীশক্তি [১৪৯]
  ঋত্বিক মল্লিক
- সুস্থতায় যোগাসন [১৫৩]
  তুষার শীল
- সংখ্যালঘু উন্নয়নেও মমতা-স্পর্শ [১৫৫]
  নাজির হোসেন লস্কর

উপন্যাস

- নাম লইয়া কান্দি [১৫৯]
  প্রবীর ঘোষ রায়
- তুষারভূমের খঞ্জ রাজ্ঞী [৩২৩]
  দেবাশিস পাঠক

গল্প

- দৈত্যের বাগানে শিশু [১৮১]
  শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
- সেই সকাল [১৯৩]
  সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
- একতলা, দোতলা [১৯৭]
  কৃণাল ঘোষ
- দ্বিতীয় তরঙ্গ [২০১]
  নবকুমার বসু
- নিয়াণ্ডারথাল [২১৩]
  ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
- পাতকুয়ো [২২১]
  অভিরূপ সরকার
- নথ [২২৭]
  অতীন জানা
- আগুনের দেওয়াল [২৩৩]
  দীপান্বিতা রায়
- ফরেন মন্টু [২৪১]
  পার্থসারথি গুহ
- ইতি তোমার মানি... [২৪৯]
  বিতস্তা ঘোষাল
- রিভেঞ্জ [২৫৭]
  দেবারতি মুখোপাধ্যায়
- ক্ষেত্রজ সন্তান [২৬৩]
  দেবযানী বসু কুমার
- কালপেঁচা [২৬৭]
  হামিরউদ্দিন মিদ্যা
- রোপওয়ে [২৭৩]
  দেবাশিস কর্মকার
- একাত্তরে একা [২৮১]
  প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
- ননীবালা [২৮৭]
  সুগত চক্রবর্তী
- কনট্রাক্ট [২৯৩]
  মণীশ কীর্তনীয়া
- স্মৃতিকণা [৩০১]
  গোলাম রাশিদ
- ঘাস ফড়িং [৩০৫]
  রাধামাধব মণ্ডল
- সমুদ্রের বাড়ি [৩০৭]
  অনীশ ঘোষ
- তথাস্তু [৩১৭]
  বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
- দু'জনে [৩২১]
  শিবনাথ দাস

কবিতা [৩৭৯-৩৮৮]

- সুবোধ সরকার ■ জয় গোস্বামী ■ ইন্দ্রনীল সেন
- দেবাশিস চন্দ ■ অনুরাধা ঘোষ ■ সুব্রতা ঘোষ রায়
- সমরেন্দ্র সরকার ■ বীথি চট্টোপাধ্যায়
- প্রদীপ আচার্য ■ অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
- অরিজিৎ চক্রবর্তী ■ চিরঞ্জিৎ সাহা ■ সুদীপ রাহা
- অভীক মজুমদার ■ ফারুক আহমেদ
- সুপ্রিয় চন্দ ■ গোলাম রসুল

রম্যরচনা

- হাসিতে হাসিও না [৩৮৯]
  সমীরকুমার ঘোষ

বিজ্ঞান

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : নৈতিকতার আঙ্গিকে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ [৩৯৫]
  দীপ্র ভট্টাচার্য

সূচি

■ কোষ হ্যাকার ভাইরাস
প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী [৩৯৭]
■ বাঙালি ডাইনোসররা
বিশ্বজিৎ দাস [৪০৩]
■ পৃথিবীর বুকের রহস্যের খাসমহল
অর্পণ পাল [৪০৯]

স্বাস্থ্য

■ দিদির স্বাস্থ্যবিপ্লব
ডাঃ শান্তনু সেন [৪১৫]
■ সবুরে মেওয়া ফলে
ডাঃ পল্লব বসু [৪১৯]
■ অ্যালোপ্যাথির বিকল্প চিকিৎসা
ডাঃ প্রদ্যোৎবিকাশ করমহাপাত্র
ডাঃ প্রকাশ মল্লিক [৪২৫]
■ ৬ বড় রোগের টিপস
শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী [৪৩৩]
■ গভীর অনুশোচনাও প্রলেপ দিতে পারে না রাগের ক্ষতে
সৌম্য সিংহ [৪৪১]

ভ্রমণ

■ বাংলার নতুন স্পট
অংশুমান চক্রবর্তী [৪৪৭]
■ কম খরচে বিদেশ ভ্রমণ
পৌলমী ভৌমিক [৪৫৫]
■ বনে থাকে বাঘ
উৎপল সিনহা [৪৬৭]
■ বিনা ভিসায় বিদেশ ভ্রমণ
রমাপদ পাহাড়ি [৪৭৩]
■ ভ্রমি মন্দিরে মন্দিরে খুঁজি দেবতারে
চৈতালী সিনহা [৪৭৯]
■ সুদিন ফিরবে আমাজনে?
ফাল্গুনী দে [৪৮৫]

শব্দবাংলা ● শুভজ্যোতি রায় [৪৯৩]

বিনোদন

■ মহানায়ক উত্তমকুমার
জয়দীপ চক্রবর্তী [৪৯৪]
■ 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের'
অদিতি মুন্সি চক্রবর্তী
শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী [৫০০]
■ বাংলা ব্যান্ড এবং বাংলা রক
সিদ্ধার্থ রায় [৫১০]

নাটক

■ তুমি ঠিক যদি ভাবো তুমি ঠিক
অর্পিতা ঘোষ [৫১৭]

খেলা

■ মানসিকতায় বদল হল কোথায়
জয়ন্ত চক্রবর্তী [৫৪৩]
■ দুর্দান্ত বই উপহার পাওয়ার অনবদ্য কাহিনি
দেবাশিস দত্ত [৫৪৬]
■ ঘোড়ার আগে গাড়ি
রূপক সাহা [৫৪৯]
■ বিদেশিহীন লিগের সুফল পাবে বাংলা
মানস ভট্টাচার্য [৫৫৩]
■ সোনার ছেলে
অলোক সরকার [৫৫৭]

অলঙ্করণে

● শংকর বসাক ● পৃথ্বীরাজ পাল
● মৃণাল দেবনাথ ● ইমরান রহমান

মূল্য : ১০০

সারা দেশের মাতৃশক্তির জেগে ওঠার পালা

আকাশে শরতের মেঘ। কখনও সোনালি রোদ, কখনও বৃষ্টি। কাশের বনে বাতাসের দোলা। মা এলেন। পুজো এল। শারদোৎসব উপস্থিত। পাশাপাশি বাংলার বৃহত্তম অর্থনৈতিক বৃত্ত হাসি ফোটাচ্ছে লক্ষ লক্ষ পরিবারে। সেই সঙ্গেই হাজির শারদ সাহিত্য সম্ভার। আর এই খুশির দিনেও, সন্ধিক্ষণের শপথ মনে রাখার পালা। দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার পালা। বাংলাকে রাখতে হবে উন্নয়ন আর শুভশক্তির দুর্জয় ঘাঁটি। কুৎসা, প্রতিহিংসা, বৈষম্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বাংলাকে। তার সঙ্গে বৃহত্তর লড়াইতে দেশে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তির সরকার। বাংলাকে বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের ডাক দিয়েছে সময়। সময়ের সেই ডাক পালন করতে হবে। বাংলার মাতৃশক্তি বাংলাকে শুভশক্তির এক দুর্ভেদ্য দুর্গ করে তুলেছে। এবার সারা দেশের মাতৃশক্তির জেগে ওঠার পালা। এবারের শরৎ, এবারের মাতৃ আরাধনা তাই আরও গভীর তাৎপর্যবাহী। বাংলা আজ যা ভাবে, কাল গোটা দেশ তাই ভাবে, আরও একবার প্রমাণ করার দিন আসছে।

একাত্তরে একা

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স এখন সত্তর পেরিয়ে প্রায় একাত্তর। স্বামী মারা গেছেন বেশ কিছুদিন হল। অনুভা এখন বালুরঘাটে একটা নাচের স্কুল চালায়। নিজে আর নাচ শেখাতে পারে না। সিনিয়র ছাত্রীরা, যারা এখন ওর সঙ্গে আছে, তারাই মূলত শেখায়। প্রত্যেক বছর এর-ওর কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে একটা অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম করতে হয়। ছেলে বিয়ের পরে বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে ছেলেকে পড়িয়েছিল। কিন্তু, ক্রিয়েটিভ শাশুড়ির সঙ্গে বউয়ের ঠিক বনেনি। তাই অনুভা মোটামুটি একা এবং জীবনটা জাস্ট ভালভাবে শেষ করার অপেক্ষায়।

ডিআইসিও অফিস থেকে ফোন এসেছিল। একজন নতুন, ইয়ং অফিসার জয়েন করেছেন, অয়ন চ্যাটার্জি। বালুরঘাট এমনিই সংস্কৃতির শহর। সেখানে ডিআইসিও-র কাজের চাপটা অন্যান্য পাঁচটা মহকুমা শহরের থেকে বা জেলা সদরের থেকে অনেক বেশিই থাকে। সারা বছরই সরকারি, বেসরকারি কোনও না কোনও অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। সেগুলোকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা এবং বালুরঘাটের ক্রিয়েটিভ স্ট্যান্ডার্ডকে ধরে রাখার যে চ্যালেঞ্জটা থাকে, সেটা বেশ ভালভাবেই করছেন এই ভদ্রলোক।

সেই চ্যাটার্জি সাহেব অনুভাকে ফোন করে বললেন, ‘‘ম্যাডাম ২১ ফেব্রুয়ারি হিলিতে একটা অনুষ্ঠান আছে। আর আপনি তো জানেন যে, প্রত্যেক বছরই আমরা ভাষা দিবসে হিলির ইমিগ্রেশন চেক পোস্টের ওই সামনের জায়গাটাতে একটা মঞ্চ করে প্রোগ্রাম করি। তা এবার একটু বড় করে করছি আমরা। ওপার বাংলা থেকেও বেশ কিছু শিল্পী আসছেন। তো আপনার টিমকে নিয়ে যদি আপনি আসেন তাহলে খুব ভাল হয়। আপনি কি এখনই কনফার্ম করতে পারবেন?’’

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কনফার্ম করল অনুভা। এগুলোই তো এখানে লাইফ-ব্লাড। এগুলোই তো এখানে বেঁচে থাকার সব থেকে বড় উপাদান। প্রান্তিক শহরে শিল্প চর্চা, সংস্কৃতি চর্চা, সাহিত্যচর্চা— এটাই এই শহরগুলোর ইউএসপি। প্রত্যেক বছর ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস হিসেবে হিলির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে উদযাপিত হয়। সেখানে অনুভাও গেছে কয়েকবার। মাঝে দু-এক বছর ডাক পায়নি। আজকে ডাক পেয়েই তাই মনটা খুব ভাল হয়ে গেল। একটু নস্টালজিকও হয়ে গেল। সে প্রায় সাথে সাথেই হ্যাঁ বলে দিল। ‘‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব স্যার।’’ ডিআইসিও স্যার কাজের মানুষ। বললেন, ‘‘ঠিক আছে, তাহলে গাড়ি পাঠিয়ে দেব এবং সময়টা আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেওয়া হবে। সেই সময়ের মধ্যেই চলে আসবেন। ওখানে তো মেকআপ করার জায়গা নেই, ফলে আপনার গ্রুপকে মেকআপ করিয়ে নিয়ে আসবেন। আমরা পরে আপনার সাথে কথা বলে নেব।’’

ফোনটা আসার পর থেকে অনুভার মনটা খুব অন্যরকম হয়ে গেল। এমন না যে, এর আগে প্রোগ্রাম করেনি। যতবারই এই সীমান্তটায় যায়, বিশেষ করে ২১ ফেব্রুয়ারি, তখন খুব নস্টালজিক হয়ে পড়ে অনুভা। কখনও কাউকে বলতে পারেনি কারণটা। আর সেগুলো বলার কোনও মানেও হয় না! প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কেটে গেছে, কিন্তু কিছু স্মৃতি আজও বোধহয় মনকে অকারণে বিরক্ত করে। সত্যিই কি বিরক্ত করে? বিরক্ত হয় ও? নাকি নিজেই ভালবাসে স্মৃতিগুলোর আছাড়ানি মনের দেওয়ালে?

অনুভা ভীষণ কনফিউজড হয়ে যায় মাঝে মাঝে নিজেকে নিয়ে। আজও এই স্টেট অফ কনফিউশনই কাজ করছে। ভাল লাগা, নস্টালজিয়া, মন খারাপ, এক অদ্ভুত মিশেল! কেন যে হয় এইসব এই বয়সে?

২১ ফেব্রুয়ারির আর তিন-চারদিন বাকি আছে। আজকে তো সতেরো, সতেরোই ফেব্রুয়ারি। অনুভা গ্রুপের সিনিয়র ছাত্রী সন্দীপ্তাকে একটা ফোন করে দিল, ‘‘তোরা রেডি কর। আমাদের এপার বাংলা, ওপার বাংলার মৈত্রী নিয়ে যে প্রোডাকশনটা আছে ওটা।’’ সাধারণত সরকারি অফিস থেকে ছোট গাড়ি পাঠায়, স্করপিও গোছের। তাতে ও নিজে সামনে বসলে পিছনে এবং মাঝখানে মিলিয়ে ওই চার-পাঁচজনই যেতে পারে। সেইভাবেই টিমটাকে সাজাতে বলল। সন্দীপ্তা ভীষণ খুশি। বলল, ‘‘দিদি মাঝখানে বছর দুয়েক আমরা ডাক পাইনি। এবার ডাক পেয়েছি, আমার খুব ভাল লাগছে। আমি তৈরি করে নেব, তুমি চিন্তা কোরো না।’’ পরের দিন রিহার্সালে গেল ও। এখনও অনুভার স্কুলটা আছে। নিয়মিত ক্লাস হয় বলে, মোটামুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই থাকে। আর যেহেতু মেয়েরাই মূলত শেখে এবং তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই তারা গুছিয়ে রাখে সবকিছু। ঘরে অনুভার অল্প বয়সের নাচের অনেক ছবি। পরে মধ্য বয়সেরও অনেক ছবি যেখানে ও কোনও নাচের অনুষ্ঠানে জাজমেন্ট দিতে গেছে। তারপর গ্রুপের মেয়েদের ছবি, বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে পারফর্ম করার।

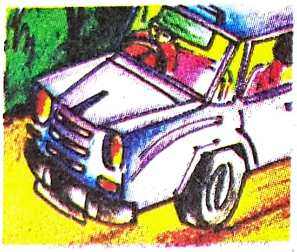

> প্রান্তিক শহরে শিল্প চর্চা, সংস্কৃতি চর্চা, সাহিত্যচর্চা— এটাই এই শহরগুলোর ইউএসপি। প্রত্যেক বছর ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস হিসেবে হিলির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে উদযাপিত হয়।

সবকিছু মিলিয়ে দেওয়ালটা কথা বলে। ‘নৃত্যম’ যে এই দিনাজপুরের সংস্কৃতিতে একটা খুব উজ্জ্বল নাম, সেটা কেউ এই ঘরে ঢুকলেই বুঝতে পারবে। রিহার্সাল চলছিল। এই প্রোডাকশনটা অনুভারও খুব প্রিয়। সাহরিয়ার আহমেদ বলে এক ভদ্রলোকের লেখার একটা অ্যাডপটেশন। কথাগুলো কোথাও মন ছুঁয়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি, ভাষা দিবস, এপার বাংলা-ওপার বাংলা সবকিছু মিলিয়ে একটা অদ্ভুত ফিল আছে গোটা প্রোডাকশনটার মধ্যে। ভালই লাগবে সবার।

পরের দিন সকালে ডিআইসিও-র অফিস থেকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজটা ঢুকল। অফিসিয়াল মেসেজ। কৃষ্টিক এবং টু দ্য পয়েন্ট। ‘‘রিপোর্টিং টাইম অ্যাট হিলি ৮:৩০ এএম। ভেহিকেল উইল রিপোর্ট টু ইউ অ্যাকরডিংলি। রিগার্ডস মেসেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর।’’

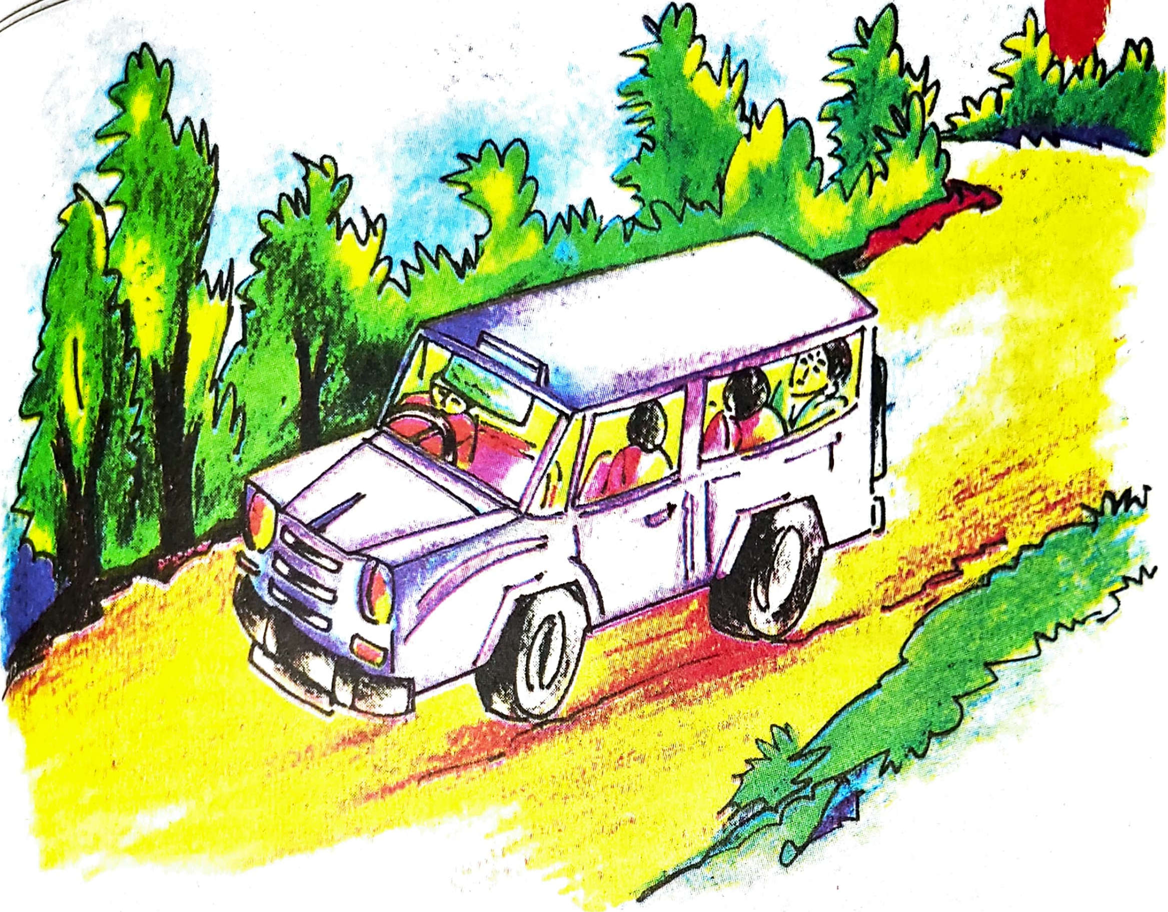

তার মানে গাড়ি ওই সাতটা, সওয়া সাতটার মধ্যেই চলে আসবে! কারণ, হিলি যেতে তো চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবেই। ওখানে গিয়ে একটু গুছিয়ে নেওয়া থাকে প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে। একজ্যাক্ট প্রোগ্রাম শিডিউলটা যেহেতু দেয়নি, তাই অনুভা বুঝতে পারছে না যে, একদম প্রথমেই করতে হবে, না একটু পরের দিকে। সে যাই হোক, মোটামুটি মেয়েদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, সবাই সাতটার মধ্যে চলে এসো। অত সকাল সকাল রেডি হওয়াটা একটু কঠিন, কিন্তু ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানগুলো একটু সকালের দিকেই সাধারণত হয়। ওরা অভ্যস্ত। বালুরঘাট থেকে অমৃতখণ্ড, মালঞ্চ, ত্রিমোহিনী হয়ে যে রাস্তাটা হিলির দিকে চলে গেছে, সেটার দু'দিকটা এত সবুজ, আর এত মায়াবী, যে যতবার ও গেছে, ততবার একটা অন্যরকম প্রশান্তি অনুভব করে। রাস্তাটা এখন আগের থেকে অনেক ভাল হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে যেতে যেতে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ছিল অনুভার।

সকাল আটটা কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই হিলি পৌঁছে গেল অনুভার টিম। গিয়ে দেখল যে, অত সকালেও ওপার বাংলার অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক পৌঁছে গেছেন। এই একটা দিন বিএসএফ এবং বিজিবি-র মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকে। বাংলাদেশের শিল্পীদের ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে কিছুটা অংশ ঢোকার একটা অলিখিত অনুমতি বিএসএফ দেয়। আবার ভারতীয় শিল্পীরাও যখন দিনাজপুরে প্রোগ্রাম করতে যান, এই একটা দিনে অন্তত এক কিলোমিটারের মধ্যে প্রোগ্রাম হলে বিজিবি-ও খুব একটা আপত্তি করে না। এই একদিন রাডক্লিফ-লাইনটা মুছে যায়। ২১ তো সীমানা মোছার-ই দিন!

সরকারি অনুষ্ঠান তাই স্বভাবতই সরকারি আধিকারিকদের একটা গৌরবজনক উপস্থিতি সেখানে রয়েছে। জেলাশাসক থেকে জেলার পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক থেকে থানার ইন-চার্জ সকলেই হাজির হয়েছেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, লোকাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিলি থেকে, সব মিলিয়ে হিলি হাল্কা করেই জমজমাট!

ভাষাদিবস নিয়ে সরকারি আধিকারিকদের বক্তব্য শুনতে শুনতে অনুভার কোথাও একটা মনে হচ্ছিল যে, ওঁরা বোধহয় কোথাও আবেগটা মিস করছেন। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, তার ঐতিহাসিক পটভূমিকাটা একটু পড়াশোনা করলেই জানা যায় এবং সেটা জানা এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু সবথেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, ভাষার জন্য এই লড়াইটা বাহান্ন থেকে শুরু হওয়ার পরে একাত্তরে কোথাও একটা পৃথিবীর প্রথম ভাষাভিত্তিক-রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল, যার নাম

'বাংলাদেশ'। ভাষা নিয়ে এই আবেগটা অনেক আমলারাই ধরতে পারেন না।

দুটো ঘটনাকে বোধহয় আলাদা করে দেখা খুব কঠিন। অন্তত অনুভার কাছে। একদম মনে করতে চায় না ও একাত্তরের স্মৃতিগুলো। কিন্তু, না চাইলেও কিছু কিছু স্মৃতি এত উত্ত্যক্ত করে না!

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে উত্তর বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা এপারের দিনাজপুর, তখন যেটা পশ্চিম দিনাজপুর ছিল, সেখানে গোপনে আশ্রয় নিয়েছিল। অবিভক্ত বঙ্গের সবথেকে বড় জেলা ছিল দিনাজপুর। যা ৪৭শে দু'টুকরো হয়ে যায়। আর মাঝখান দিয়ে চলে যায় রাডক্লিফ লাইন। দিনাজপুর বরাবরই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জেলা ছিল। ফলে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধেও স্বভাবতই দিনাজপুর একটা বড় রোল প্লে করেছিল। ওপারের দিনাজপুরের সঙ্গে এপারের বালুরঘাটের সম্পর্কটা বরাবরই খুব নিবিড়। কারণ, অবিভক্ত দিনাজপুরের খুব গুরত্বপূর্ণ মহকুমা ছিল বালুরঘাট। '৪৭-এর দেশভাগের পরে বহু মানুষ ওপার থেকে এপারে চলে আসেন। এখনো উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর খুঁজলে এমন কিছু পরিবার পাওয়া যাবে, যাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা বাংলাদেশের দিনাজপুরে এখনও বসবাস করছেন। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অংশ যে বালুরঘাটে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজবে সেটা খুব প্রত্যাশিতই ছিল।

'৪৭-এর সময় ভারতে চলে আসা জনস্রোতের সঙ্গে '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের এদেশে আসার একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। '৪৭-এর মানুষগুলো এসেছিল মাটি খুঁজতে, '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধারা মূলত আশ্রয় নিয়েছিল, সেফ হেভেন থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজটা করার জন্য। ইন্ডিয়ান আর্মিও দিনাজপুর ফ্রন্টটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিল এবং এখনও হিলিতে সেই ওয়ার মেমোরিয়ালটা আছে, যেখানে প্রত্যেক বছর আর্মির পক্ষ থেকে ৭১-এর লড়াইয়ের বীর সৈনিকদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। খুব ইনটেন্স একটা ফাইট হয়েছিল এই হিলিতে এবং যেটা থেকে বোঝাই যায় যে, গোটা মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে দিনাজপুরের একটা অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট স্ট্র্যাটেজিক রোল ছিল। ফলে, বালুরঘাটে যে মুক্তিযোদ্ধারা শেল্টার নেবে, এটা খুব প্রত্যাশিত ছিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের একজন-দু'জন করে করে অনেক বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল। একসঙ্গে থাকলে খবর হয়ে যাওয়ার ভয়, একসঙ্গে থাকার জায়গার অসুবিধে এই ফ্যাক্টরগুলোই কোথাও একটা ওদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে হয়তো বাধ্য করেছিল। যাইহোক, বালুরঘাটের মানুষ মনে করত যে, এই মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়াটা মাটির প্রতি কর্তব্য। অনেকেরই আবার ওপারে ছেড়ে আসা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধা হয়ে এপারে আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে, বেশ কয়েক মাস অনেক পরিবারেরই অংশ হয়ে গিয়েছিল কোনও না কোনও মুক্তিযোদ্ধা।

তখন কতই বা বয়স অনুভার? কিশোরী! পাড়ার দেবাশিস কাকু এসে একটা ছেলেকে রেখে গেল। বলল ওর নাম নাকি অর্ণব। দিনাজপুর থেকে এসেছে; একজন মুক্তিযোদ্ধা।

তখন কতই বা বয়স অনুভার? কিশোরী! পাড়ার দেবাশিস কাকু এসে একটা ছেলেকে রেখে গেল। বলল ওর নাম নাকি অর্ণব। দিনাজপুর থেকে এসেছে; একজন মুক্তিযোদ্ধা। বাবা সব ব্যবস্থা করে দিলেন। বাইরের ঘরে একটা চৌকি, একটা জলের কুঁজো, আর জামা-কাপড় রাখবার জন্য একটা আলনা। মোটামুটি এটাই ছিল অর্ণবের জগৎ।

ছেলেটা ছিল লম্বা, একমাথা চুল এবং ভীষণ অর্ডিনারি দেখতে। বয়স অল্প। শুধু চোখদুটো ছিল খুব উল্লেখযোগ্য। চোখের মধ্যে কোথাও একটা আগুন ছিল। ক'বারই বা দেখেছে অনুভা। ছেলেটা সকালে উঠে জলখাবার খেয়ে কোথায় বেরিয়ে যেত। যেহেতু ওরও স্কুল ছিল সকালে, তাই দেখা হত না। এক-আধদিন ছুটির দিন হয়তো ওকে দেখেছে। মা রুটি-তরকারি করে দিয়েছেন, চুপ করে বসে খাচ্ছে। সবথেকে যেটা অদ্ভুত ছিল, ছেলেটা একদম কথা বলত না। ওর বাবা পরে বলেছিলেন যে, ওর মা আর দিদিকে নাকি খুব নৃশংস অত্যাচার করে খুন করেছিল পাকিস্তানি সেনারা। তারপর থেকে ও কথা খুব কম বলে। অনুভাদের ছোট্ট বাড়ি ছিল। পাতকুয়ো থেকে জল তুলে স্নান করতে হত। মেয়েদের জন্য অবশ্য বাথরুমে চৌবাচ্চা ছিল। বাবা সেখানে সকালে জল ভরে রাখতেন। ও আর ওর মা সেখানে স্নান করত। বাবা তো বরাবরই পাতকুয়োতলায় দাঁড়িয়ে সাবান মাখতেন। অর্ণবকে কোনওদিনও অনুভা স্নান করতে দেখেনি। ও কি স্নান-টান করত না? রাতে কখন ফিরত, সেটাও ও জানে না। হয়তো বেশি রাত করে ফিরত। মা বলতেন যে, ছেলেটার আজ ফিরতে রাত হবে। তাই রান্নাঘরের সামনে একটু রুটি-তরকারি বা কিছু ভাজা ঢাকা দিয়ে রেখে শুয়ে পড়তেন। ও কখন এসে খেয়ে নিত। এভাবেই এক-দু'মাস কেটে গেল। ছেলেটার সাথে কখনও একটা কথাও হয়নি ওর। শুধু একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় ছেলেটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাড়ির একদম সামনে। সেদিন মনে হয়, অর্ণব দেরি

করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। সাধারণত এত বেলা করে ও বেরোত না। একটা লোক যে একই বাড়িতে থাকে, প্রায় দু'মাস থেকে নিয়েছে, তার সাথে বাড়ির আরেকজন সদস্যের কোনওদিন কথাই হয় না, এটা অনুভার খুব আশ্চর্য লাগত। ও কি শুধু ওর সাথেই কথা বলে না? না। বাবা-মা-র সাথেও খুব কম কথা বলে। মা-কে জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, ''শুধু 'হ্যাঁ', 'না' করে।'' বাবা বলেছিল যে, ''থাক! ওগুলো নিয়ে ঘাঁটার দরকার নেই!''

হঠাৎ করে ওদের দু'জনের যেদিন দেখা হয়ে গেল, সেদিন অনুভার মনে একটা জেদ চেপে গেল। কী যে হল মাথায়? ও রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছেলেটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল। প্রথমবার মুখ তুলে তাকিয়ে বলেছিল, ''কী হল?'' ও বলেছিল, ''আপনি কি কথা বলেন না?'' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ছেলেটি বলেছিল যে, ''বলার মতো তো কিছু নেই।'' অনুভা বলেছিল, ''তবুও আমরা তো একই বাড়িতে থাকি। আপনি কখনও আপনার পুরো নামটাও বলেননি।'' ওর সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল, ''তোমার বাবা জানেন।'' অনুভার জেদ চেপে গেল। বলল, ''আমিও জানতে চাই।'' কিশোরীর জেদ। দেখল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। চোখ দুটো স্থির, চোয়ালটা শক্ত। কয়েক সেকেন্ড পরে শুধু চোখ তুলে বলেছিল, ''আমার বলার মতো কিছু নেই। আমার কারওর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না।'' তারপরে আর কিছু করার ছিল না ওর। বাড়িতে ফিরে এসে একা একা চুপ করে ভেবেছিল যে, নিশ্চয়ই কোনও গভীর যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এই ছেলেটা। অথবা খুব ডিটারমাইন্ড বড় কিছু করবে বলে।

ছেলেটিকে প্রশ্নগুলো করলেও সবথেকে বড় প্রশ্নটা ওর নিজের জন্যই ছিল অনুভার। আচ্ছা, ও কেন এত ডেসপারেট হয়ে গেল? একটি ছেলে, কিশোরই বলা যায়, চাল নেই, চুলো নেই, দেখতেও এমন কিছু ভাল না, কথা বলে না, তার সাথে কথা বলার জন্য অত জেদ চেপে গেল কেন? ওর কি কোথাও ভাল লাগতে শুরু করেছে অর্ণবকে? এই আকর্ষণের কারণই বা কী? ঠিক আছে, একজন কথা বলে না, বাড়িতে থাকে, তার কিছু পারিবারিক ট্রমা আছে, সে একটা রাজনৈতিক লড়াই করছে; এরকম কোনও আনরোমান্টিক মানুষের সঙ্গে তো ওর বয়সি কিশোরীর কোনও অ্যাটাচমেন্ট হওয়ার কথাই নয়। যার কোনও ভবিষ্যৎই নেই, তাকে নিয়ে তো কোনও ভবিষ্যতের স্বপ্নই দেখা যায় না। তাহলে কেন?

এই 'কেন'-র উত্তরটাই সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছে অনুভা। এমনিতে ও ছিল খুব শান্ত স্বভাবের একটি মেয়ে। যে সময় ওর বান্ধবীরা স্কুল যাওয়ার পথে খিলখিল করে হাসত, সমবয়স্ক ছেলেদের দেখে একটু আড়চোখে তাকাত, তাদের ভাললাগাগুলোকে নিয়ে কোথাও বান্ধবী মহলে হাসাহাসি, আলোচনা করত; অনুভা ঠিক সে টাইপটা ছিল না। অথচ, জীবনে সে প্রথমবার অনুভব করেছিল যে, এই ছেলেটি কোথাও একটা প্রভাব বিস্তার করেছে ওর মনের মধ্যে। সেটা কী বা কেন তা ওর কাছে খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। অর্ণব আর অস্পষ্টতা দুটো প্রায় সমার্থক হয়ে গেছিল অনুভার জীবনে।

সে সময় বালুরঘাটে খুব কম সংখ্যক পুজো হত। কিন্তু, ভীষণ সাবেকিয়ানা ছিল পুজোগুলোর মধ্যে। পাল-বাড়ি, পতিরাম ঘোষ-বাড়ি এরকম আরও কিছু

ছোট ছোট ট্র্যাডিশনাল পুজো, যা এখনও হয় বালুরঘাটে, সেগুলোতে লোকে ভিড় জমাত। পুজোগুলো ছিল একটা একান্নবর্তী পরিবারের একসাথে হওয়ার জায়গার মতো। পাঁচটা দিন হুশ করে কেটে যেত। তারপর একদিন আত্রেয়ীর জলে সবাই মিলে ভাসান দিতে যাওয়া, নদীর ধারে এয়োস্ত্রীদের সিঁদুর খেলা, আর ছোটদের মিষ্টিমুখ। বালুরঘাটের পুজোটা বরাবরই কোথাও একটু অন্যরকম। অষ্টমীর দিন ও শাড়ি পরেছিল। সরস্বতী পুজো ছাড়া ওই একদিনই ও শাড়ি পরত, শখ করে। মা সাজিয়ে দিয়েছিল। বেরনোর সময় অর্ণবকে ও দেখেনি। খুব ইচ্ছে করছিল যে, একবার যদি দেখা হয়। কিন্তু মা বলল, খুব সকালেই বেরিয়ে গেছে। অষ্টমীর দিন কারওর এত কাজ থাকে? মণ্ডপে বসে বন্ধুদের সাথে খিচুড়ি খেতে খেতেও অষ্টমীটা সেরকম উপভোগ করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল যে, কোথাও কিছু একটা মিস করছে ও। কী যে মিস করছে, কেনই যে মিস করছে সেটা ও নিজেও জানত না।

পুজোর পর থেকে অর্ণবের হারিয়ে যাওয়াটা আরও বাড়ল। বাবা বলেছিলেন একদিন, ওদিকটায় নাকি যুদ্ধ তীব্র হচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি হওয়াটা নাকি শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভারতীয় সেনা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত আক্রমণের চাপে একাত্তরের নভেম্বরের শেষ দিক থেকে পাকিস্তানি ফৌজ তখন অনেকটাই ব্যাকফুটে। ধুর, এসব শুনতে ভালই লাগত না ওর। কবে যে থামবে যুদ্ধটা? তারপরেই মনে হত যে, আচ্ছা, ওর কী? কাদের যুদ্ধ, কারা লড়ছে, তাদের মধ্যে হয়তো একজনকে ও চেনে, তাতে কীই-বা এসে যায়। কয়েক মাস আগেও যাকে চিনত না, কয়েক মাসেও যার সাথে কোনও কথা হয়নি, তার থাকা বা না-থাকা কেনই বা ইম্পর্ট্যান্ট হতে যাবে? কিন্তু কিশোরীর মন বড্ড অস্থির। যুক্তি বরাবরই অসহায় অত্মসমর্পণ করে আবেগের কাছে। একাত্তরের নভেম্বরের একেবারে শেষ বা ডিসেম্বরের শুরুর দিকে অর্ণব বেরিয়ে গিয়েছিল। আর কখনওই দেখা হয়নি। বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন যে, একটা 'ইনটেনস ব্যাটেল' হচ্ছে এখন। সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখন হয়তো বেশ কিছুদিন ও আসতে পারবে না। বাবাকে নাকি বলে গিয়েছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, নতুন বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পরে ও একবার আসবে, দেখা করে যাবে।

সেই একাত্তর থেকে ২০২৩, কতটা সময় কেটে গেল, কবেই তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। মাঝখানে ও জীবনে কতটা রাস্তা হেঁটে এসেছে। কখনও আসেনি অর্ণব। লজ্জায়, সংকোচে কখনও বাবাকে জিজ্ঞাসাও করতে পারেনি যে, কোনও ঠিকানা আছে কি না চিঠি লেখার জন্য। কালের নিয়মে একদিন সংসারী হল অনুভা। স্বামী-সন্তান সবকিছু নিয়ে এক পরিপূর্ণ নারী। কিন্তু, সত্যিই কি সে পরিপূর্ণ ছিল? সেদিনটার কথা ও এখনও ভোলেনি। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের একদম শেষ সপ্তাহের কথা। ততদিনে পাকিস্তানি সেনা ভারতীয় সেনার সামনে আত্মসমর্পণ করেছিল। দেবাশিসকাকু বাড়িতে এসেছিলেন। বাবার সাথে কিছু আলোচনা করছিলেন চাপা স্বরে। ও গুরুত্ব দেয়নি। শুধু একটা কথা কানে এসেছিল, হিলিতে নাকি মারাত্মক লড়াই হয়েছে ১৯৭১-এর নভেম্বরের শেষ দিকে আর ডিসেম্বরের প্রথম দিকটাতে। তাতে নাকি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে অনেক মুক্তিযোদ্ধা খুন হয়েছে। অনুভা কানটা খাড়া করে ছিল কাজ করার অছিলায়। যদি আর কিছু শুনতে পায়? না, অর্ণব নিয়ে কোনও কথা হয়নি। অ্যাটলিস্ট ওর কানে আসেনি।

তারও অনেকদিন পরে, একদিন সাহস করে মা-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মা ওই ছেলেটার কী হল?" মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "ঠিক জানি না। তোর বাবা মনে হয় কিছুটা জানে।" বাবাকে জিজ্ঞাসা করার সাহস ছিল না ওর। মা কে বলেছিল, "বলো না? কী শুনেছ?" মা বলেছিলেন, "জানি না। অনেকেই তো মারা গেছে হিলির যুদ্ধে। ওর খবরটা জানি না।" বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল। অর্ণব নয় তো?

"ম্যাম, প্রোগ্রাম কেমন লাগল?" কিছুটা চমকে উঠেছিল অনুভা।

"ম্যাম, প্রোগ্রাম কেমন লাগল?" কিছুটা চমকে উঠেছিল অনুভা। ডিআইসিও সাহেব সামনে। অনুভা তো এতক্ষণ প্রোগ্রাম দেখছিলই না! ও ফ্ল্যাশ ব্যাকে কিছু একটা স্মৃতি রোমন্থন করছিল—যেটা ওর কাছেও খুব স্পষ্ট ছিল না।

"হ্যাঁ, খুব ভাল হয়েছে ডিআইসিও সাহেব। অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম, আমি দেখেছি গত এক-দু'বার আপনাদের ডাকা হয়নি, হয়তো মিস হয়ে গেছিল অফিসের। আমি যতদিন আছি, প্রত্যেকবার ডাকব। খুব ভাল অনুষ্ঠান করেছে আপনার গ্রুপ। মন ছুঁয়ে গেছে সবার।"

গাড়িতে উঠতে উঠতে মনে হচ্ছিল, মনটা বোধহয় হিলিতেই ফেলে আসছে অনুভা। এখানেই কি কোথাও...? জানে না। নাম না-জানা অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার লাশের মধ্যে অর্ণবেরটাও পড়ে ছিল কি না? কোনও আইডেন্টিফিকেশনের ব্যবস্থাই ছিল না। হিলিটা না বড্ড মন খারাপ করে দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারি আবার আসবে। অন্তত এই একটা দিনে তো স্মৃতির খুব কাছাকাছি আসা যায়। ওর-ও তো সত্তর পেরিয়েছে। আজ একাত্তরে ও নিজেও বড় একা। *

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072

Regd. No. WBBEN / 2004/14087

Postal No. Kol RMS/352/2012-2014

City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

editorial@jagobangla.in

/DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

e-paper :www.epaper.jagobangla.in